তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত ঔপন্যাসিকদের জীবনকথা ও সাহিত্যকৃতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

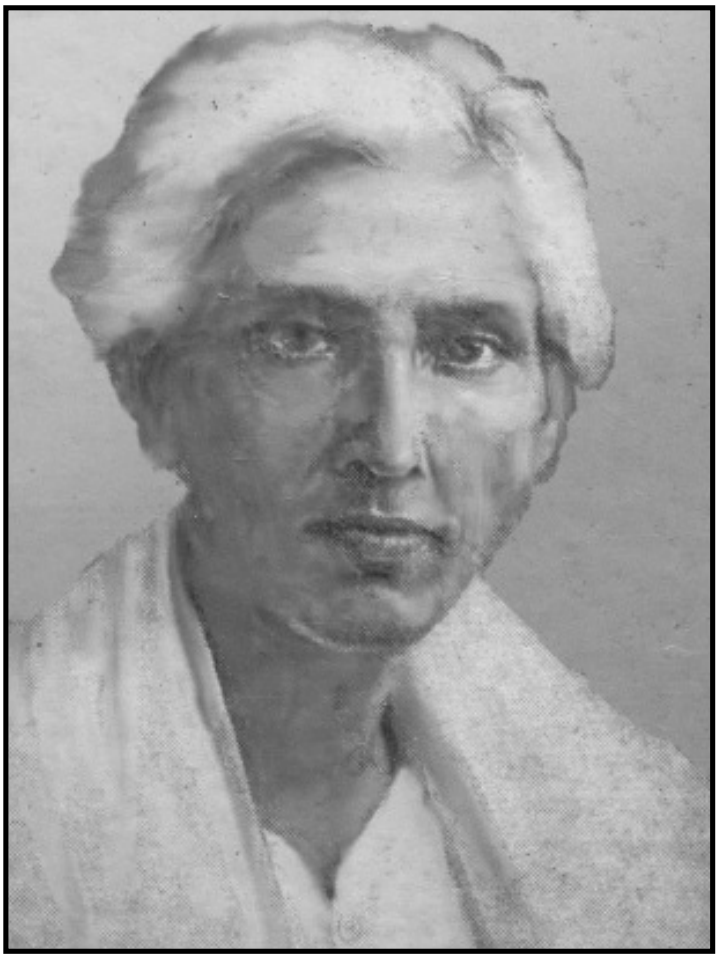

জন্ম : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ মৃত্যু : ১৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮

অফুরন্ত পথ চলায় যাঁর আনন্দ। বিলাসী মনের সম্রাট যিনি, তিনি একই সঙ্গে ভবঘুরেও। যিনি তাঁর যাযাবর জীবনকে নিয়েছিলেন একান্ত আত্মিক করে। যার দৌলতে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে বঙ্গদেশের নানা স্তরে বিন্যস্ত বসবাসী মানবজীবনের বাস্তবতার প্রত্যক্ষ রূপকে। তিনি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়

কালজয়ী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দরিদ্র মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের ঘর আলো করে একটি শিশু কান্নার শব্দে আগমনী বার্তা দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কেউ কি সেদিন ভেবেছিলেন, এই কান্নার আভাস শুধুমাত্র সাধারণ ভূমিষ্ঠ শিশুসুলভ কান্না নয়। একদিন সাধারণ পল্লী মানব-মানবীর অশ্রুনিমীলিত দুঃখ-যন্ত্রণার ও ক্রন্দনের আলেখ্য তাঁর কলমে ফুটে উঠবে। শৈশব, কৈশোর ও যৌবন দরিদ্রতায়, অবহেলায় যিনি অতিক্রম করেছেন। পরোক্ষভাবে এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন ও অবহেলাই তাঁকে অনির্দিষ্ট পথের পথিক করে তুলেছিল। যে জীবনে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন। দরিদ্র ঘরের সন্তান শরৎচন্দ্র। ধন-সম্পদের পরিবর্তে উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন অস্থির ভাবাবেগ, উদাসীন স্বভাব এবং সাহিত্য সাধনার ব্রত। যা তাঁকে করে রেখেছে অমর, অজেয় আজও। তাঁর সৃষ্টির ক্ষয়হীন যে সম্পদ কখনও শেষ হওয়ার নয়, যা অমূল্য। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদক টমসনের ভূমিকায়, শরৎচন্দ্রের আত্মবিবরণ অংশে উল্লিখিত অংশকে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে —

> "*From my Father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The First made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, but never could finish anything. I have not his work now – Somehow it got lost, but I remember pouring over those incompleteness. Over and over again in my childhood, and many a night I kept awake regretting their incompleteness and thinking what might have been their conclusion, If finish probably his led to my writing short stories when I was barely seventeen.*"[১]

শরৎচন্দ্র কোন আত্মজীবনী লিখে যাননি বা খুব পারম্পর্যপূর্ণভাবে জীবন কাহিনিও বলেননি।

শরৎচন্দ্র অনুরাগী ভক্ত, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বা কোন বক্তৃতায় যা আলোচনা করতেন তা থেকেই তাঁর জীবনকে বুঝে নিতে হয়। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। কিছুটা বাউণ্ডুলে স্বভাবের বলা যায়। এই স্বভাব সাহিত্যিক মননজাত। কারণ, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক বড় মাপের সাহিত্যিকদের মনই ছিল ভবঘুরে। এই স্বভাবের জন্য বাংলার বাইরে ব্রহ্মদেশে, রেঙ্গুনে ঘুরে বেড়িয়েছেন। জীবনে চলার পথে সূক্ষ্মভাবে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যা পরবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্যের উপাদানে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে বার্মার স্মৃতি তাঁর সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। শরৎচন্দ্র সমাজ, সংসার প্রভৃতি বন্ধনের দ্বারা কোনদিনই বাঁধা পড়েননি। ছন্নছাড়া বোহেমিয়ান জীবনই তাঁর প্রিয় ছিল। আপন মনের টানে, অজানা পথের সন্ধানে চলাই তাঁর কাছে সবচেয়ে ভাল লাগত। শরৎচন্দ্রের এই জীবন-যাপন সে যুগে নীতিবাগীশদের মনঃপুত হয়নি। তাঁর চরিত্র ও শিল্পীজীবন বহুবিচিত্র। ছন্নছাড়া ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এবং বোহেমিয়ান জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে তাঁর সাহিত্যজগতে ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক রসে পুষ্ট সমাজের এমন জীবন্ত পল্লীচিত্র নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের এই জীবন-যাপনের যথার্থ মূল্যায়ন সেই সময়ে বাংলায় কেউ না করলেও বাংলার বাইরেও তিনি ছিলেন আদৃত। তাই হিন্দিভাষী বিষ্ণু প্রভাকর তাঁর ছন্নছাড়া জীবনেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীমনের আত্মানুসন্ধানে সমাজজিজ্ঞাসু মনকে গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর জীবনী রচনায় সাহস করেছিলেন। যার নামই দিয়েছিলেন 'আওয়ারা মঁসীহা'। 'আওয়ারা মঁসীহা'র বাংলা অনুবাদ করেছেন দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল 'ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ'। এই জীবনীর 'অনুবাদিকার কথা' অংশে অনুবাদিকা শরৎজীবনী সম্পর্কে বলেছেন–

> ''আওয়ারা মসীহা পড়েছ? যেখানেই গেছি এই একই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। অধীর আগ্রহে বইখানি পড়তে শুরু করি। 'আওয়ারা মসীহা'য় (ছন্নছাড়া মহাপ্রাণে) শরৎচন্দ্রকে নতুন আঙ্গিকে দেখার এই সুযোগ পেয়ে আমি অভিভূত হই। লেখক অত্যন্ত যত্ন, অনুসন্ধান ও পরিশ্রমে শরৎচন্দ্রের বহু বিতর্কিত সংশয়াছন্ন জীবনকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা ভাষায় এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অভাবে বেদনা পেয়েছি। পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে এই শরৎকে সবার মনের দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু কেমন করে? চকিতে মনে হল, বইখানি যদি বাংলায় অনুবাদ করি,

কেমন হয়? বাংলার একক দাবিদার শরৎকে পুরোপুরি জানতে কে না আগ্রহী?

এই বিশ্বাসই নিয়ত আমাকে 'আওয়ারা মঁসীহা' বইটিকে বাংলায় অনুবাদের

প্রেরণা দিয়েছে।"[২]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যার মৃদুস্নিগ্ধ উদয় হয়েছিল রবির পাশেই। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' (১৯১৩), অনেকেই মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথই ছদ্মনামে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই লেখা পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর গল্পে, উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের মতো কল্পলোকচারী প্রেম ও বঙ্কিমের রোমান্সের বিপুল ঐশ্বর্য ভাণ্ডার নেই বললেই চলে। তবুও শরৎ সাহিত্য এত জনপ্রিয়। শুধু বাংলায় নয়, ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ইংরেজি ও ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনুদিত হয়ে ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। আসলে তাঁর উপন্যাস, গল্পের কাহিনিগুলো সাধারণ পল্লীজীবনের বাস্তব, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তুলে আনা। তার মধ্যে মহৎ আদর্শ বা মৌলিক তত্ত্বের আড়ম্বর নেই। মানুষের দুঃখ, বেদনা, মর্ম যন্ত্রণা, নর-নারীর প্রেমের সম্পর্কও তাঁর সাহিত্যে বিদ্যমান। পরিচিত জগতের কাহিনির মধ্যে অত্যন্ত সহানুভূতি দিয়ে সাধারণ মানব জীবনকে তুলে ধরেছেন। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি, মান-অভিমান, মনোমালিন্য, তারপর আবার একঘেয়েমি, জীবনযাত্রার ছবি তাঁর লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন চলছিল তেমনি, তবু জীবন বৈচিত্র নিয়ে আসে। এই ধরনের ঘরোয়া পারিবারিক কাহিনিগুলো সহজ রচনায় সহানুভূতির রসে জাড়িত হয়ে পাঠক চিত্তে প্রবেশ করে। পাঠক পড়তে পড়তে সহানুভূতি ও আবেগের সঙ্গে সেই চরিত্রগুলোর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন। এখানে তত্ত্ব নয়, মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অথবা সমাজ তত্ত্ব বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না। শুধু স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে অতি তুচ্ছ সাধারণ নর-নারীদের মনোযন্ত্রণা, বেদনা, সমাজের অনাচার-অবিচার। তাই তা হয়ে ওঠে সাধারণ পাঠকের হৃদয়ের কাছের জিনিষ। শরৎচন্দ্র তাঁর কালে এবং আজও তত্ত্ব জিজ্ঞাসার যুগে সাধারণ পাঠকের এত কাছের এবং প্রিয়। কারণ সাধারণ মন বা সাধারণ পাঠক আবেগ এবং ভাবাবেগে তত্ত্ব মীমাংসা খুঁজে না। খুঁজে এমনই হৃদয়গ্রাহী কাহিনি।

শরৎ সাহিত্যের চরিত্র নিয়ে কাহিনি নিয়ে অনেক সমালোচক অনেক তির্যক উক্তি করেছেন। তবুও তিনি তাঁর কালে সমাদৃত ছিলেন আজও জনপ্রিয়। যদিও তাঁর সাহিত্য কালকে অতিক্রম করে কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে কিনা তা একটা প্রশ্নচিহ্ন। শরৎতের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি এক আর্কেটাইপ বা আকল্পের

বাইরে এসে কতটুকু নিজের স্থান করে নিতে পেরেছে আজকের নারীচেতনাবাদের যুগে তাও প্রশ্নচিহ্ন। কিন্তু তাঁকে এবং তার রচনাকে বিচার করতে হবে সেই কালের গণ্ডিতে দাঁড়িয়েই।

শরৎ সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক, প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সহজভাবে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন–

> ''শরৎ সাহিত্যে মানুষের বেদনার ছবি যেভাবে ফুটেছে বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙালির চরিত্রের স্বাভাবিকতা যত দিন থাকবে, শরৎচন্দ্রও ততদিন পাঠকের হৃদয় রাজ্যে একাধিপত্য করবেন।''[৩]

পাঠকের হৃদয় রাজ্যের এই অধীশ্বরের জীবনপঞ্জির দিকে তাকালে ছন্নছাড়া জীবনের তুচ্ছতা ছাড়া আভিজাত্যের চিহ্নটুকু চোখে পড়ে না। এই সাদামাটা জীবনই তাঁর সাবলীল জীবনবোধ প্রকাশের মাধ্যম, সাহিত্যের চাবিকাঠি। ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর দেবানন্দপুরে নিতান্ত দরিদ্রতাকে সম্বল করেই জন্মেছিলেন শরৎচন্দ্র। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ভাগ্যের বিড়ম্বনা এবং খেয়ালী স্বভাববশত সংসারে স্বচ্ছতা আনতে অক্ষম ছিলেন। অবস্থার বিপাকে মাতা ভুবনমোহিনী পিত্রালয়ে বাস করতেন। শরৎচন্দ্র বড় হয়েছিলেন মাতুলালয়ে। দেবানন্দপুরের পাঠশালায় তাঁর প্রথম শিক্ষারম্ভ। পরবর্তীকালে বাবার কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গা পরিবর্তনে তাঁর স্কুলশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল। পারিবারিক দরিদ্রতার জন্য শরৎচন্দ্রের ঠিকমত পড়াশোনা হয়ে উঠেনি। আর্থিক অনটনে অনেক দুঃখ-কষ্টে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী সময়ে মাতার মৃত্যু এবং আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ fees পূরণের অক্ষমতায় কলেজের পরীক্ষা দিতে পারেননি। উদাসীন শরৎচন্দ্র প্রথম জীবনে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জীবিকার তাগিদে একটি কাজ জুটিয়েছিলেন 'বনেলী স্টেটে'। চাকরির সন্ধানেই রেঙ্গুনে কাকা অঘোরনাথের কাছে যান। কাজের সন্ধানে এই ভবঘুরে মানুষটি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মধ্যের স্রষ্টা মন তাঁকে চাকরিতে আটকে থাকতে দেয়নি। এই সময়ে প্রবাসী জীবনে তিনি রচনা করে চলেছিলেন তাঁর একের পর এক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ।

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'শ্রীকান্ত' (১ম ১৯১৭, ২য় ১৯১৮, ৩য় ১৯২৭, ৪র্থ ১৯৩৩), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৮), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) প্রভৃতি। তাঁর জীবিতকালের শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাস' ১৯৩৫

সালে মুদ্রিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শুভদা' (১৯৩৮) এবং 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯) শেষোক্তটি অসম্পূর্ণ রেখেই শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তার অবশিষ্ট রচনা করেন শিষ্যা রাধারানী দেবী। এই উপন্যাসগুলোতে তিনি খুব জনপ্রিয় কাহিনির অবতারণা করেছিলেন। সমাজ বিগর্হিত প্রেম, বিধবার অন্য পুরুষে আসক্তি, তেমনি সতীত্ব, সংযম ইত্যাদি আদর্শকে পিছনে ফেলে সামাজিক নিয়মনীতির নিগড়ে আবদ্ধ মানব-মানবীর মর্ম বেদনার মর্মন্তুদ কাহিনি লিখে সমাজ রক্তচক্ষুশূল শাসকদের আঘাত হানতে ছাড়েননি।

অনেকগুলি উপন্যাস অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ পারিবারিক কাহিনি নিয়ে গঠিত। সেখানে সামাজিক নীতিঘটিত প্রশ্ন নেই। 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৭), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৫), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭) এই উপন্যাসগুলোতে বাংলাদেশের অতি পরিচিত চিত্রেরই ঘনঘটা। 'পল্লীসমাজ' এগুলো থেকে আলাদা। সেখানে সমাজ বিরোধী প্রেমের প্রসঙ্গও আছে। অনুত্তেজক এই পারিবারিক কাহিনির মধ্যে সহানুভূতি ও বাস্তব পটভূমিকায় সাধারণ মানবজীবনের ছবি দেখা যায়। যদিও আজকের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে তা অধিক গ্রহণযোগ্যতা পায় না। তবুও সরল, সহজ প্রাণের নমনীয়তা স্নিগ্ধমধুর ভাবোল্লাসতা পাঠককে অভিভূত করে।

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি পাঠকসমাজে অসাধারণ ঠেকেছিল যা সমানভাবে আজও আদৃত। এখানে গফুরের দারিদ্রপীড়িত জীবনকাহিনি ঘটনার আবর্তে শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম সমাজতাত্ত্বিকতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ১৯০৩ সালে 'মন্দির' গল্পটির জন্য শরৎচন্দ্র 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে 'নারীর মূল্য' (১৯৩০), 'তরুণের বিদ্রোহ' (১৯১৯), 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (১৯৩২) এবং কয়েকটি বক্তৃতাও (শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ) ছাপা হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের কিছু কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রিশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি এতগুলি শ্রেষ্ঠ ও বিচিত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা আজও সাধারণ পাঠক সমাজে আকর্ষণীয় ও সমাদৃত। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের উপর চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে অনেক ভাষায়। বহুচর্চিত 'দেবদাস', 'পরিণীতা' ইত্যাদি চলচ্চিত্ররূপে জীবন্ত রূপলাভ করেছে এবং সমাদৃত হয়েছে। আজকের সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে হয়তো শরৎ-সাহিত্যের নানা মাত্রা আমাদের বিশ্লেষণী পাঠে উঠে আসে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অম্লান জনপ্রীতি দরদী ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক বীক্ষা নিয়ে এই কালজয়ী মানুষটির নিরন্তর সাহিত্যব্রত, তাঁকে সৃষ্টির মাধ্যমেই অজেয় ও অমর করে রেখেছে। এই অমর কথাশিল্পীর জীবনাবসান হয় ১৯৩৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি।

সাহিত্য, সৃজন ও কীর্তি

শরৎচন্দ্র দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার ব্রত পালন করে গিয়েছেন। তাঁর আজীবনের অতুল সম্পদ ভাণ্ডার এই সাহিত্য কীর্তিসমূহ।

শরৎ রচনাবলী, গ্রন্থাবলী এবং সংকলন গ্রন্থগুলি বাদ দিয়ে মোট ৪৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উপন্যাস–৩০, শ্রীকান্তকে অখণ্ডরূপে ধরলে '২৭', ছোটগল্প-৩, প্রবন্ধ ও ভাষণ–৪, স্বনামে লিখিত নাট্যরূপ–৩, পত্রাবলী–২ এবং বিবিধ রচনা –১টি।

ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে কিছু সংখ্যক গ্রন্থ। যেমন–১। অসমিয়া–১৬টি, ২। উড়িয়া–৮টি, ৩। উর্দু–২৩টি, ৪। কানাড়া–৪৪টি, ৫। গুজরাটি–৭৩টি, ৬। তেলেগু–৩২টি, ৭। তামিল–৩০টি, ৮। পাঞ্জাবী-৩টি, ৯। মারাঠী–২৭টি, ১০। মালায়ালাম–২২টি, ১১। সিন্ধি–২৯টি, ১২। সংস্কৃত–২টি এবং বিদেশি অন্যান্য ভাষায়–১৩। সিলনীয়–২টি, ১৪। ইংরেজি–১১টি সহ আরও অন্যান্য বিদেশি ভাষায় শরৎচন্দ্রের বহু চর্চিত রচনাগুলি অনুদিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের রচিত গ্রন্থসমূহ

কালানুক্রমিক তালিকা

১।	১৯১৩, সেপ্টেম্বর	–	বড়দিদি (উপন্যাস)
২।	১৯১৪, মে	–	বিরাজবৌ (উপন্যাস)
৩।	১৯১৪, মে	–	গল্পসমষ্টি বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প)
৪।	১৯১৪, আগস্ট	–	পরিণীতা (উপন্যাস)
৫।	১৯১৪, সেপ্টেম্বর	–	পণ্ডিমশাই (উপন্যাস)
৬।	১৯১৫, ডিসেম্বর	–	মেজদিদি (গল্পসমষ্টি)
৭।	১৯১৬, জানুয়ারি	–	পল্লীসমাজ (উপন্যাস)
৮।	১৯১৬, মার্চ	–	চন্দ্রনাথ (উপন্যাস)

৯।	১৯১৬, আগস্ট	–	বৈকুণ্ঠের উইল (গল্প)
১০।	১৯১৬, আগস্ট	–	অরক্ষণীয়া (গল্প)
১১।	১৯১৭, ফেব্রুয়ারি	–	শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (উপন্যাস)
১২।	১৯১৭, জুন	–	দেবদাস (উপন্যাস)
১৩।	১৯১৭, জুলাই	–	নিষ্কৃতি (গল্প)
১৪।	১৯১৭, সেপ্টেম্বর	–	কাশীনাথ (গল্পসমষ্টি)
১৫।	১৯১৭, নভেম্বর	–	চরিত্রহীন (উপন্যাস)
১৬।	১৯১৮, ফেব্রুয়ারি	–	স্বামী (গল্পসমষ্টি)
১৭।	১৯১৮, সেপ্টেম্বর	–	দত্তা (উপন্যাস)
১৮।	১৯১৮, সেপ্টেম্বর	–	শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (উপন্যাস খণ্ড)
১৯।	১৯২০, জানুয়ারি	–	ছবি (গল্পসমষ্টি)
২০।	১৯২০, মার্চ	–	গৃহদাহ (উপন্যাস)
২১।	১৯২০, অক্টোবর	–	বামুনের মেয়ে (উপন্যাস)
২২।	১৯২০, এপ্রিল	–	নারীর মূল্য (প্রবন্ধ)
২৩।	১৯২৩, আগস্ট	–	দেনা পাওনা (উপন্যাস)
২৪।	১৯২৪, অক্টোবর	–	নব বিধান (উপন্যাস)
২৫।	১৯২৬, মার্চ	–	হরিলক্ষ্মী (গল্পসমষ্টি)
২৬।	১৯২৬, আগস্ট	–	পথের দাবী (উপন্যাস)
২৭।	১৯২৭, এপ্রিল	–	শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব (উপন্যাস)
২৮।	১৯২৭, আগস্ট	–	ষোড়শী (দেনাপাওনা-র নাট্যরূপ)
২৯।	১৯২৮, আগস্ট	–	রমা (পল্লীসমাজ-র নাট্যরূপ)
৩০।	১৯২৯, এপ্রিল	–	তরুণের বিদ্রোহ (প্রবন্ধ গ্রন্থ)
৩১।	১৯৩১, মে	–	শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)
৩২।	১৯৩২, আগস্ট	–	শ্রীকান্ত ও সাহিত্য (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

৩৩।	১৯৩৩, মার্চ	–	শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (উপন্যাস)
৩৪।	১৯৩৪, মার্চ	–	অনুরাধা, সতী ও পরেশ (গল্প সমষ্টি)
৩৫।	১৯৩৪, ডিসেম্বর	–	বিজয়া (দত্তার নাট্যরূপ)
৩৬।	১৯৩৫, ফেব্রুয়ারি	–	বিপ্রদাস (উপন্যাস)

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত রচনাসমূহ

৩৭।	১৯৩৭, মার্চ	–	শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ ভাষাসমষ্টি, সম্পাদনা : দেবেন মুরারি দে।
৩৮।	১৯৩৮, এপ্রিল	–	ছেলেবেলার গল্প (তরুণ পাঠ্য গল্প সমষ্টি)
৩৯।	১৯৩৮, জুন	–	শুভদা (উপন্যাস)
৪০।	১৯৩৯, জুন	–	শেষের পরিচয় (উপন্যাস, শেষ অংশ রাধারাণী দেবী দ্বারা লিখিত)
৪১।	১৯৪৮, ফেব্রুয়ারি	–	শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী সম্পাদনা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪২।	১৯৫১, জুলাই	–	শরৎচন্দ্রের পুস্তকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী। সম্পাদনা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৩।	১৯৫৪, নভেম্বর	–	শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র গ্রন্থের সঙ্গে তার আরও অন্যান্য চিঠিপত্রগুলি সংযোগ রূপে পত্রাবলী অখণ্ড গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাপ্ত সংবর্ধনা ও সম্মাননা

১। ১৯০৩ সালে গল্প প্রতিযোগিতা ‘মন্দির’ গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার।

২। ১৯২৩ সালে বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখা কর্তৃক অভিনন্দন। এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ লাভ।

৩। ১৯২৬– সুরমা উপত্যকা বর্তমান (বরাক) উপত্যকার ছাত্র-সম্মিলনের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং শিলচর ছাত্রসংঘ তাঁকে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দন জানান।

৪। ১৯২৭– শিবপুর সাহিত্য-সংসদের উদ্যোগে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৫। ১৯২৭– শ্রীকান্ত ১ম পর্বে ইংরেজি অনুবাদ পাঠ শুনে রমাঁ রোল্যাঁ তাঁকে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির ঔপন্যাসিকের সম্মান দেন।

৬। ১৯২৮– জন্মদিনের শুভদিনে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে দেশবাসী দ্বারা সংবর্ধনা।

৭। ১৯৩০– লাহোর–প্রবাসী দ্বারা সংবর্ধনা।

৮। ১৯৩২ (১৮ সেপ্টেম্বর)– কলকাতা টাউন হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

৯। ১৯৩৬– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি গ্রহণ।

১০। ১৯৩৭– জন্মদিনে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ও বিদ্যাসাগর কলেজে সংবর্ধনা।

(তালিকাটি গৃহীত, আজকের ধূমকেতু, শরৎচন্দ্র : স্মরণ-নিরীক্ষণ, ৬ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, সম্পাদক - কৃষ্ণা বসু, ২০১২)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

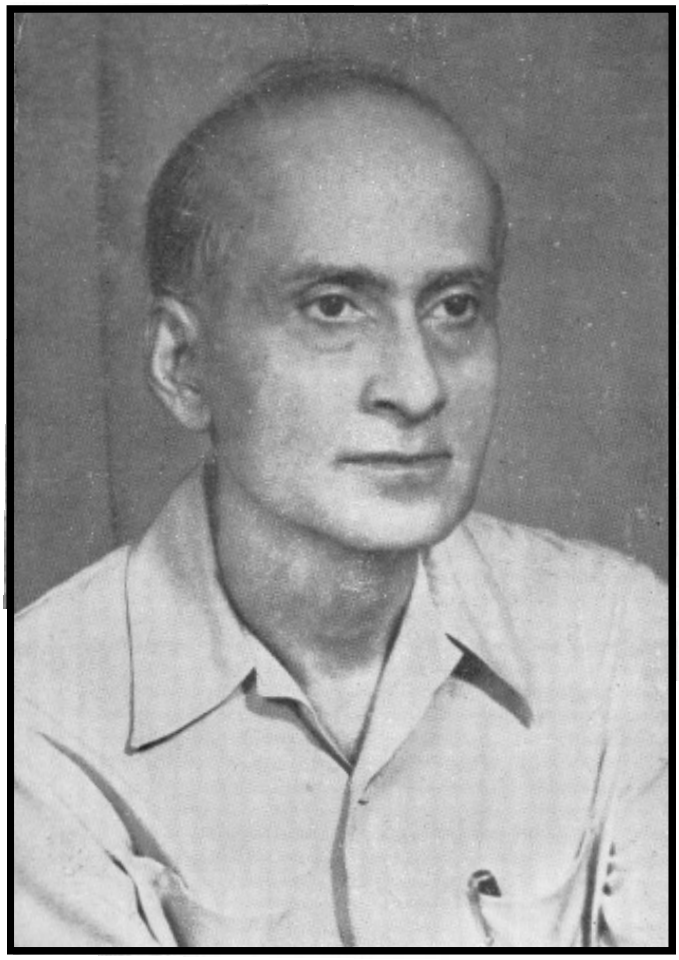

জন্ম : ৫ অক্টোবর, ১৮৯৪ মৃত্যু : ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬১

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন বহুমুখী চিন্তাবিদ। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবর বাবার মাতুলালয় শ্রীরামপুরের চাতরাতে ধূর্জটিপ্রসাদের জন্ম হয়। বাবা ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায় পেশায় ছিলেন আইনজীবী। মা এলোকেশী দেবী। ধূর্জটিপ্রসাদের চার ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান, তবে জ্যেষ্ঠ পুত্র। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অর্থনীতির ছাত্র, পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক। কিন্তু নিজের জ্ঞানের সীমানাকে কোনো গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখেননি। তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক। জীবনে মার্কসবাদে বিশ্বাস রেখেছেন। সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেননি। তিনি নিজেকে মার্কসিস্ট না বলে, বলেছেন মার্ক্সোলজিস্ট (Marxologist)। আজ তাঁর বিচিত্র চিন্তাধারার

প্রবন্ধ, গল্প, বিভিন্ন রচনা সম্ভার আমাদের কাছে এক অতুল সম্পদ। তাঁর আগ্রহ বিস্তৃত ছিল সমাজবিজ্ঞান, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ছুঁয়ে সাহিত্য পর্যন্ত। ইংরেজি এবং বাংলায় লিখেছেন প্রবন্ধ গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় গল্প, উপন্যাস, দিনলিপি। সংগীতের প্রতি অনুরাগ জন্মেছে পারিবারিক সূত্রে যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থে। জীবনে জ্ঞানস্পৃহা ও একাগ্রতার জন্য পেয়েছেন মনীষীদের স্নেহসান্নিধ্য। তাঁদের মধ্যে তিনজনের কাছে তিনি বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করে গেছেন।

> ''তিনজন মনীষীর কাছে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ঋণ স্বীকার করে গেছেন। প্রমথ চৌধুরীর কাছে ভাবতে শেখেন, চিন্তার সূত্রগুলিকে বিন্যস্ত করে লিখতে শেখেন। কারণ প্রথম দিকে তার ভাষা অগোছালো হত, শব্দ ও প্রকরণের ব্যবহার শুদ্ধ ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর কাছেই তাঁর লেখার মক্স, ধরতাই বুলি আর চলতি মতামতকে চ্যালেঞ্জ করার ইচ্ছা, সাহস ও শক্তিসঞ্চয়। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছ থেকে অধীত বিদ্যাকে হজম করা, শুদ্ধ স্বচ্ছ ভাষায় কঠিন বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করা এক কথায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধর্মদর্শন ও সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে অনুপ্রবিষ্ট করা– ধূর্জটিপ্রসাদ শিখতে চেষ্টা করেন। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে আপন ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, আত্মস্থতা বা আত্মশক্তির চর্চা, ভারতীয় সমাজ সত্তার মৌলিক বোধ, সংযম ও ধৈর্য প্রয়োগে ব্যক্তিগত দুঃখ মনস্তাপের ওপরে উঠে, সৃষ্টিধর্মী কাজে নিজেকে নিযুক্ত করার নিয়ত প্রয়াস (যাকে বলা হয় 'সাবলিমেশ্যান')– এরকম অনেক কিছুই।''[৪]

ছোটবেলা থেকে ঘরোয়া পরিবেশে বাবার সাহচর্যে এবং আদেশে পড়িয়ে শোনাতে হত তাঁকে ইংল্যান্ডের ইতিহাস, মর্লের লেখা গ্ল্যাডস্টোনের জীবনী প্রভৃতি। তারপর স্কুলে ঈশান ঘোষের ইতিহাস ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য পড়ানোর পদ্ধতিতে এই বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ জন্মে। বিভিন্ন জ্ঞানী ও গুণিজনের সাহচর্যে তিনি জ্ঞানের অসীম সাগরে সাঁতার কেটেছেন। এভাবেই বোধহয় তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকে। তাই স্কুল, কলেজের সিলেবাসের বাইরে বিভিন্ন ধরনের বই কেনা ও পড়া তাঁর শখ হয়ে দাঁড়ায়। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন–

''আমার মনে হতো, সকলেই ক্ষুদ্রে ক্ষান্ত হতে বারণ করেছেন। বিদ্যাবুদ্ধির অসীমতাই আমার শিক্ষা। শুধু দুরাশা পোষণ করেই ক্ষান্ত হইনি। সেজন্য খেটেওছি।''[৫]

শিক্ষাজীবন, কলকাতার হেয়ার স্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে বারাসাত সরকারি স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংরেজি ও সংস্কৃত বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করেছিলেন কিন্তু অসুস্থতার জন্য আই. এস. সি. পরীক্ষায় বসতে পারেননি। ১৯১২ সালে রিপণ কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯১২-১৯১৫ মধ্যে রিপণ কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি. এ. কোর্সে ভর্তি হন, কিন্তু পাশ করতে পারেননি। ১৯১৬ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নিজের স্বভাব সম্পর্কে তিনি নিজেই পরে মন্তব্য করেছিলেন, –

''ছিলাম এক কথায় ফাজিল ছেলে– অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক পড়তাম না, বাজে বই পড়তাম, যা পড়তাম তার চেয়ে বেশি কিনতাম, তারও বেশী ঘাঁটতাম ও আরো বেশী 'চাল' দিতাম। টাকার ভাবনা এক হিসেবে ছিল না, কেবল বাবা ও মা চপ, কাটলেট, দর্জি ও বই-এর দোকানের বিল শোধ দেবার সময় রাগারাগি করতেন– এইটুকু ছাড়া। চাকরিবাকরির কথা মনে পড়তো না। পড়াশুনার সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক আমার অজ্ঞাত ছিল। ভালো ছেলের সঙ্গে যেমন মিলেছি, বখা ছেলের সঙ্গে তেমনই, বোধহয় একটু বেশী প্রাণ খুলে। একটা গোঁড়ামি ছিল চরিত্র সম্বন্ধে। গান শিখতাম ও ভালবাসতাম, তবে ধ্রুপদ – তার নীচুতে নামিনি, থিয়েটার খেলাধুলোর সখ ছিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি তবে আগ্রহ ছিল না, লোভ তো নয়ই। বন্ধুত্ব করেছি প্রাণ ভরে সমবয়সীদের সঙ্গে। যা কিছু রোমান্স প্রধানতঃ ওদেরই সঙ্গে। অন্যসব ছুটকো-ছাটকা– দু'এক বছরের বেশী তাদের জান্ ছিল না। কল্পনা বিলাসী ছিলাম না। তবে কল্পনা ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতি কোন প্রকার আসক্তি ছিল না। বাংলা বই বলতাম, বাংলা সাহিত্য বলতাম না। স্বদেশী যুগে

বন্দেমাতরম গেয়েছি বটে। কিন্তু যেন মনে ধরেনি। খেলা, সাঁতার দেওয়া, গাছে চড়া, স্বেচ্ছাসেবক হওয়া, বন্যা– প্রপীড়িতের উদ্ধার, গ্রাম-সুধার, নাটক, স্কুলে ইংরেজীতে বক্তৃতা – কিছু বাদ দিইনি বটে। কিন্তু হুজুকে পড়ে। মোদ্দা কথা পলিটিক্যাল জীব হিসাবে না।"[৬]

তাঁর নিজস্ব বক্তব্য থেকেই ধূর্জটিপ্রসাদের স্বভাবজাত পরিচয় অনুধাবন করা যায়। ১৯১৮ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ইতিহাসে এম.এ করেন এবং ১৯১৯ সালে ছায়া বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। ১৯২০ সালে আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে এম.এ, প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করেন। কর্মজীবন – ১৯২১ সালে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯২২ সালে ১লা আগস্ট লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ এবং পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রফেসর হিসেবে যোগদান। কর্মজীবনের এই সময়সীমায় বহুমুখী প্রতিভার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব শুধু শিক্ষাদান নিয়ে ব্যস্ত থাকেননি। বিভিন্ন সৃজনমূলক সৃষ্টি সম্ভারও উপহার দিয়েছেন। তারপরও ছিল নিজের শারীরিক ব্যাঘাত ও পারিবারিক অনাকাঙ্ক্ষিত ভ্রাতৃবিয়োগ। কিন্তু এই ঘটনাগুলো তাঁকে আঘাত দিলেও তিনি ভেঙে পড়েননি। ১৯২০ সালেই ধূর্জটিপ্রসাদের পিতৃ-বিয়োগ ঘটেছিল। তারপর সক্রিয়ভাবে পারিবারিক সমস্ত দায়িত্বভার বর্তেছিল তারই উপর। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি একমাত্র পুত্র কুমারপ্রসাদের জন্ম হয়।

ধূর্জটিপ্রসাদের জীবন অভিজ্ঞতাই ছিল বিচিত্র। দীর্ঘ বত্রিশ বছর লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তার সঙ্গে তিনি অর্থনীতি বিষয়েও বিভিন্ন প্রবন্ধমূলক রচনা ও গবেষণাও করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত প্রযোজ্য,—

"ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে ডি পি ছিলেন সেই পথিকৃৎ যিনি সুশৃঙ্খলভাবে ভারতীয় শ্রেণী এবং সংস্কৃতির বিচার করেছেন।"[৭]

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সভা সমিতিতে যোগদান করেছেন। ১৯৩৮ সালে ২৫ জানুয়ারি যুক্ত প্রদেশে উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সরকারের 'ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন' পদটি গ্রহণ করেন। ১৯৪০ এর ১ অক্টোবর এই পদে ইস্তফা দেন। ১৯৪৭ সালে যুক্ত প্রদেশ সরকার তাঁকে লেবর ইনকোয়ারি কমিটির সদস্য নির্বাচিত করেন। ১৯৫২ তে লেনিনের স্বপ্নের দেশ রাশিয়া যাত্রা ইকনমিক ডেলিগেট হিসেবে।

১৯৫৩-র ১৯ অক্টোবর থেকে ১৯৫৪-র ১৪ মে পর্যন্ত 'হেগ'-এ ইনস্টিটিউট সোশাল'-এ সমাজতত্ত্বের ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৪ সালেই আবার 'ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল কনফারেন্স'-এ সভাপতি ছিলেন। একই বছর 'বাণ্ডুং' সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর অবাধ বিচরণ এবং বহুমাত্রিক পরিচিতি ছিল। যশ এবং ব্যস্ততার ভিতরে ভিতরে বাংলার গদ্যচর্চার স্বতন্ত্র এবং সাহিত্যে প্রথা দ্বারা মুক্তির উন্মুখতার জন্য কলম ধরেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। যে শিক্ষা, ভাবনা, পরিশ্রম এবং বুদ্ধিবাদী চর্চা ধূর্জটিপ্রসাদ অর্জন করেছেন এর ফল ফলেছে তাঁর জীবন জুড়ে। সমাজ বিজ্ঞানে সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে অবাধ বিচরণ করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। মনোজ্ঞ পাঠক তাঁর রচনা থেকে খুঁজে নিতে পারে একাধিক তাত্ত্বিক সংজ্ঞা। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি চর্চায় এবং সাহিত্যকে বহুমুখী দর্শনের সামনেই যেন তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বারবার ঘুরে ফিরে দেখেছেন সৃষ্টির বহু বিচিত্র নান্দনিকতাকে। তার প্রমাণ তাঁর রচিত একমাত্র উপন্যাস ত্রয়ী 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা'। আর এই বুদ্ধিজীবী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ১৯৬১ সালের ৫ই ডিসেম্বর ক্যান্সার রোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কর্ম ও কৃতিত্ব

১। ১৯২১ সাল, বঙ্গবাসী কলেজে প্রথম অধ্যাপনায় যোগ দেন।

২। ১৯২২ সাল, ১লা আগস্ট লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান।

৩। ১৯৩৮, ২৫শে জানুয়ারি, যুক্ত প্রদেশ সরকারের 'ডাইরেক্টর অফ ইনফর্মেশন' পদে যোগদান।

৪। ১৯৪০ সাল, ৩১ অক্টোবরে সরকারি পদ ত্যাগ করেন।

৫। ১৯৪৭ সালে আবার যুক্ত প্রদেশের লেবার এনকোয়ারি কমিটির সদস্য পদে যোগ।

৬। ১৯৪৯ সালের ৫ই নভেম্বর 'প্রফেসর' পদ গ্রহণ।

৭। ১৯৫২ সালে রাশিয়ায় ইকনমিক ডেলিগেট হিসেবে যাত্রা।

৮। ১৯৫৩ সাল, হেগ এ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ-এর ভিজিটিং প্রফেসর অব সোসিওলজি।

৯। ১৯৪৫ সাল, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রোফেসর হিসেবে পদ গ্রহণ।

১০। ১৯৫৫ সাল, এপ্রিল, All India Sociological Conference-এর সভাপতি পদে যোগ। আগস্টে বান্ডুঙ কনফারেন্সে যোগ।

১১। ১৯৫৯ সালের ৩০ অক্টোবর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ।

সৃজন

বাংলা রচনাসমূহ

১। ১৯৩১ সাল, প্রবন্ধগ্রন্থ 'আমরা ও তাঁহারা'।

২। ১৯৩৩ সাল, 'রিয়ালিস্ট' একমাত্র গল্প সংকলন।

৩। ১৯৩৩ সাল, 'চিন্তয়সি'।

৪। ১৯৩৫ সাল, 'অন্তঃশীলা' উপন্যাস প্রকল্প।

৫। ১৯৩৫ সাল, 'সুর ও সঙ্গতি' রবীন্দ্রনাথের ও ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত বিষয়ক পত্র সংকলন।

৬। ১৯৩৭ সাল, 'আবর্ত'।

৭। ১৯৩৮ সাল, 'কথা ও সুর' সংগীত গ্রন্থ প্রকাশ।

৮। ১৯৪৩ সাল, 'মোহানা'।

৯। ১৯৫৬ সাল, মনে এলো (দিনলিপি)।

১০। ১৯৫৭ সাল, 'বক্তব্য' প্রবন্ধ গ্রন্থ।

১১। ১৯৬১ সাল, ঝিলিমিলি (দিনলিপি)।

১২। ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী প্রথম খণ্ড, দে'জ পালিশিং ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।

১৩। ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, মে, ১৯৮৭।

১৪। ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭।

ইংরেজি রচনাসমূহ

১। 1924 July, Personality and social sciences.

২। 1932, Basic concepts of Sociology.

৩। 1942, Modern Indian Cultute. A Sociological Study.

৪। 1943 August, 'Tagore A Study'.

৫। 1945, On Indian History, A Study in Methods.

৬। 1945, Indian music, An Introduction.

৭। 1946, Views and Counterviews.

৮। 1946, Problem of Indian youth.

৯। 1958, Diversites, Essays in Economics, Sociology and other Social Problems.

ধূর্জটিপ্রসাদ কৃত গ্রন্থ পর্যালোচনার তালিকা

বাংলা গ্রন্থসমূহ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাশিয়ার চিঠি।

২। দিলীপ কুমার রায়, বীরবল ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ পত্রাবলী– ধর্ম ও বিজ্ঞান।

৩। প্রমথ চৌধুরী ঃ ঘরে-বাইরে।

৪। বিষ্ণু দে ঃ চোরাবালি।

৫। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : বসুন্ধরা।

৬। সমর সেন : নানাকথা।

৭। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : শিশির।

৮। গোপাল হালদার : সংস্কৃতির রূপান্তর।

৯। রশময় দাশ : অন্তঃশীলা।

১০। সুধীর কর : চিত্রভানু।

১১। রামপতি দত্ত ঃ রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্র নাথ।

১২। অমিয়নাথ স্যান্যাল ঃ স্মৃতির অতলে।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

১। Leon Trotsky : The History of the Russian Revolution (vector Gollanez)

২। Sir M. Iqbal : The Reconstruction of Religious. Thought in Islam, Roger Bastide (Jonathan cape) The Mystical life. Prof M.M. Zuhuruddin Ahmed Andheri-An Examination of the mystic Tendencies of Indian in the light of the Quran and Traditions, A. K. Coomerswamy- The Transformation of nature in Art.

৩। Hushih : The Chinese Renaissance.

৪। Sachin Sen : Studies in the Land Economics of Bengal, Radhakamal Mukherjee - Land Problems in India.

৫। Sidney and Beatrice webb : Soviet communism- A New civilisation.

৬। RadhaKamal Mukherjee : Hindu Civilisation.

৭। G. T. Garrat ed, The Legacy of India with an Introduction by Marquess Zetland.

৮। Pritrim Sorokin : Social and cultural Dynamics 3 volumes.

৯। Stefan Zweig : Beware of pity.

১০। Graham Greene : The Power and the Glory, John Steinbeck : To a God Unknown.

১১। Virginia-woolf : Roger Fry - A Biography.

১২। Ahmed Ali : Twilight in Delhi.

১৩। Rabindranath Tagore : My Boyhood Days.

১৪। Talbot Rice : The Background of Art.

১৫। Anjali ; Edited by Asit Kumar Halder, D. P. Mukherjee, Raikrishna Das, Jusum Shah, Published by Mrs, S. P. Shah. Lucknow, October 1940, preface by D. P. Mukherjee.

১৬। W. Friedman : World Revolution and the Future of the west.

১৭। R. N. Anschaen : Freedom its meaning.

(তালিকাটি গৃহীত, জলার্ক প্রকাশন, প্রসঙ্গ ধূর্জটিপ্রসাদ, নবম সংকলন, স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদক), ১৩৯২ বঙ্গাব্দ এবং রুশতী সেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য আকাডেমি, ২০১০)

গোপাল হালদার

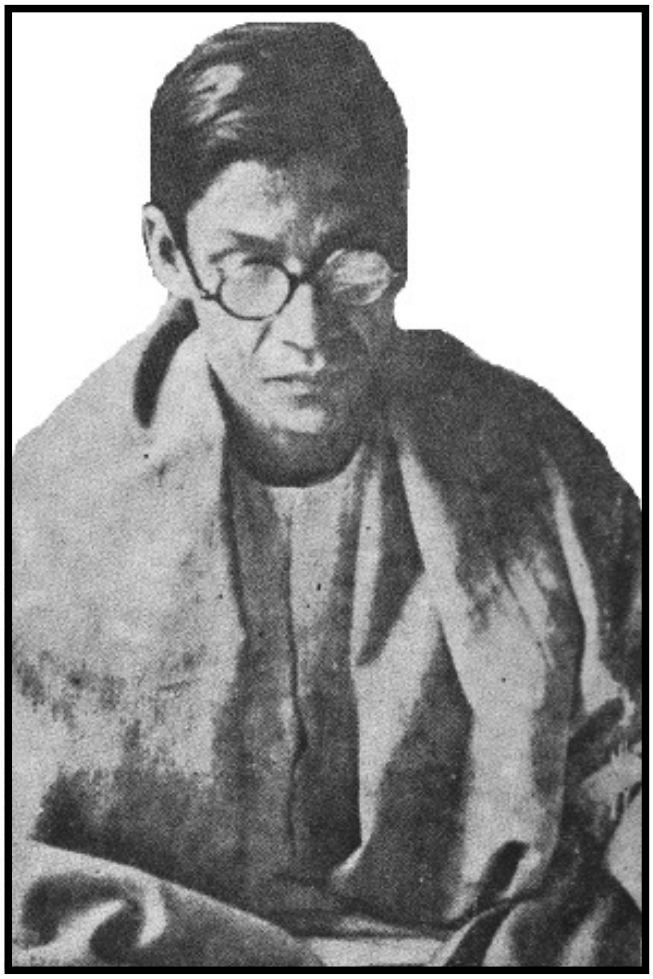

জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ মৃত্যু : ৪ অক্টোবর, ১৯৯৩

কোরালপাখির ডাকে, গ্রামবৃদ্ধেরা জানতেন,

এই জন্ম

. . . . . .

তাই এক দীর্ঘায়ু জীবনে, উপকথার মতন,

অজস্র মারের মধ্যে বেঁচে

বেঁচে যান ক্ষণজন্মা . . . .

. . . . . .

উভবলি বাঙলার কোলে

নোয়াখালি-কলকাতায়

('অসাধারণে-সাধারণে, মেলানো ধারায়'

গোপাল হালদারের জন্মদিনে, সিদ্ধেশ্বর সেন এর লিখিত কবিতা)

গোপাল হালদার যখন জন্মেছিলেন তখন গ্রামে একটিও ঘড়ি ছিল না। সময়কে ধরে রাখতে সময়-যন্ত্র-এর বহু প্রচলন তখনও হয়নি। গ্রামবৃদ্ধরা কোরাল পাখি কতক্ষণ আগে ডাক দিয়েছিল সেই অনুমানে জন্ম সময় ঠিক করেছিলেন। সবার আশঙ্কা হয়েছিল এই সময়ে জন্ম নেওয়া শিশুর আয়ু ক্ষীণ হয়। তাঁর বাঁচবার আশা কম। কিন্তু সব অনুমানকে ধূলিস্যাৎ করে তিনি দীর্ঘায়ু জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সি বলে গোপাল হালদারকে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অভিহিত করেছিলেন। বৃহত্তর মহাসময়কে আকড়ে, বৃহত্তর অস্তিত্বের আহ্বানে, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এই সকল কিছুকে একই সঙ্গে একত্রে বরণ করে নিয়েছিলেন। আচার্য সুনীতি কুমারের প্রিয় ছাত্র, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রিয় বন্ধু শ্রী গোপাল হালদার আজ নিজেও একজন স্মৃতিমধুর ব্যক্তিত্ব।

গোপাল হালদার ১৯০২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বিক্রমপুর পরগণার বিদগাঁও গ্রামে পৈতৃক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আত্মজীবনী 'রূপনারাণের কূলে'তে বলেছেন, তখন গ্রামে ঘড়ি ছিল না। তাই জন্ম সময় নির্ধারণ করতে গ্রামের প্রবীণ বৃদ্ধরা ঠিক করেছিলেন কতক্ষণ আগে কোরাল পাখি ডাক দিয়েছিল। গোপাল হালদারের পিতা পেশায় আইনজীবী সীতাকান্ত হালদার এবং মাতা বিধুমুখী দেবী। শিক্ষাজীবন শুরু হয় বাড়ির পাশে অবস্থিত বঙ্গ বিদ্যালয়ে। তারপর নোয়াখালি শহরের ইংরেজি স্কুল আর কে জুবিলি। ১৯১৮তে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হন। সেই সময়টা ছিল বিপ্লবী আন্দোলনে অস্থিরতার অগ্নিযুগ। কৈশোর, তরুণরা বিভিন্নভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। গোপাল হালদারের পরিবারেও সেই যুগের ছোঁয়া লেগেছিল। ফলে গোপাল হালদার কৈশোরেই বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। চতুর্দিকে মানুষের জীবনে দেশের জনজীবনে মহাযুদ্ধের শুরুর ফলে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

গোপাল হালদারের এই বিচিত্রমুখী স্বদেশ ভাবনা ও সংগ্রামী মানসিকতা গড়ে ওঠে তাঁর ঘর থেকেই। তখন বাড়ির বৈঠকখানায় স্বদেশী আন্দোলনের আলোচনা হত। মামা অশ্বিনী ঘোষাল ছিলেন স্বদেশীর দলভুক্ত। পিতা সীতাকান্ত হালদার ও দাদা রঙীন হালদারের সাহচর্যে স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র রপ্ত

করেছিলেন মনে। বৈঠকখানায় ছিল রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ ও আরও অনেকের ছবি।

> ''আমার স্বদেশী চেতনার জন্ম বৈঠকখানার সেই ১৯০৮-এর মে মাসের টুকরো টুকরো আলোচনায়।''[৮]

শৈশবেই তপ্ত অগ্নিযুগের লেলিহান শিখার দীপ্তিতে গোপাল হালদারের মানসগঠন হয়েছিল। বিবেকানন্দের বিশেষ বাণী তাকে আকৃষ্ট করেছিল 'তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সেই তিনি যুগান্তর দলের সদস্য হিসেবে যোগ দেন। কাজ ছিল নিষিদ্ধ বইপত্র বা পত্র পত্রিকা অত্যন্ত গোপনভাবে লুকিয়ে রাখা।

একদিকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন। আবার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহকে অস্ত্র করে শুরু হল আন্দোলন। ১৯১৯-এ রাওলাট আইন পাস হয়। এর প্রতিবাদে ৫ই এপ্রিল অখণ্ড বঙ্গে হরতাল শুরু হয়। তারপর ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড সমস্ত দেশকে স্তম্ভিত করে দিল। গোটা দেশে হিন্দু-মুসলিমের সমর্থনে শুরু হল গান্ধীজির নেতৃত্বে 'অসহযোগ আন্দোলন'। এই অশান্ত সময়েই গোপাল হালদারের যৌবনের পথচলা, জীবনে নতুন দিকদর্শন। তিনি উপলব্ধি করলেন সাহিত্য স্বাধীনতার চেতনাকে জাগরিত করলে তা মানস গঠনে সহায়ক হয়। কারণ বৈঠকখানায় বঙ্কিম, বিবেকানন্দের রচনা তাঁর হাতে থাকত, এখান থেকেই তাঁর বোধন এবং রবীন্দ্ররচনা তাঁকে শোধন করেছে। তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন তার জীবনে দু'টি বিশেষ প্রভাবের কথা।

> ''দু'টি বিশেষ প্রভাব আমার উপর পড়েছিল। একদিকে বিবেকানন্দের দেশ ও জন সেবার প্রেরণা আর একদিকে রবীন্দ্র সাধনা। বিশেষ করে রবীন্দ্র অবদান, অর্থাৎ সামগ্রিকতার একটা বোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, সমগ্রের, বৃহতের এক চেতনা। তাই স্বদেশীতেই যাই, আর সাহিত্যই করি– এই বৃহৎ বিশ্ববোধের আঙিনায় দাঁড়িয়েই তা করি।''[৯]

ব্যক্তিগত জীবনের চাওয়া পাওয়াকে তুচ্ছ করে ওগিলভী হোস্টেলের জীবনে একদিকে ছিল দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ, কর্মঠ বিপ্লবীর জীবন-দর্শন। অন্যদিকে অধ্যয়ন, শিল্প, সাহিত্য চর্চা। তিনি পড়াশোনা শেষ করে নোয়াখালিতে ফিরে এসে স্বরাজ সাধনায় নিজেকে সমর্পিত করেন। সে যুগটা ছিল আন্দোলনের যুগ। দলে দলে যুবক-যুবতীরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাড়া দিয়েছিলেন প্রতিবাদী

আন্দোলনে। জেল ভরে গিয়েছিল সত্যাগ্রহীদের দিয়ে। তার মধ্যে গোপাল হালদার একজন। 'রূপনারাণের কূলে'তে তিনি লিখেছেন—

> ''মাস তিন পরে পরীক্ষা। এ কি পরীক্ষার সময়? মুখ দেখাব কি করে? –
> এমন বৎসরে স্বরাজের থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে থাকি?''[১০]

বিপ্লবী গোপাল হালদার আপন সময়কে মন্থন করেছেন, ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন দেশের জন্য। এই মেধাবী যুবক শুধু সক্রিয় কর্মে নন, সাহিত্যে, গল্পে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, পত্র-পত্রিকায় লিখে মননশীল আলোক জ্বালিয়েছেন জাতির জীবনে। এর মধ্য দিয়েই চলছে তার শিক্ষাজীবন ও পারিবারিক জীবন। ১৯১৮-২২ সালের সময়সীমায় কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে আই,এ পরে বি,এ ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেন। কলেজ জীবনে সহপাঠি ছিলেন ওটেন বিরোধী 'দাগী' ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু যিনি সেবার দর্শনে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হন। নীরদচন্দ্র চৌধুরী ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস হন। এঁদের সাহচর্যও ছিল তার জীবনদর্শনে। ১৯২২ সালে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে পাশ করেন গোপাল হালদার। পরে ইংরেজিতে এম,এ করেছিলেন। আইন পরীক্ষা পাশ করে কৃতিত্বের জন্য 'টেগোর ল' পুরস্কার পান। এর মধ্যে তাঁর বিয়েও হয়েছিল ১৯৪৯ সালে অরুণা হালদারের সঙ্গে। এই বিশৃঙ্খল সমাজজীবনে জীবিকার জন্য তাঁকে করতে হয়েছে অধ্যাপনা, ওকালতি এবং পরবর্তীতে সাংবাদিকতা। মানবতাবাদী, বুদ্ধিবাদী মানবমুক্তির আহ্বায়ক, সংগ্রামী গোপাল হালদারকে জেলেও যেতে হয়েছে বারবার। ১৯৩২ এপ্রিল থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি বক্‌সা জেলে এবং কিছুকাল তাঁকে অন্তরীণও রাখা হয়।

প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন লেখেন বিশিষ্ট লেখা 'কয়েদির আকাশ'।

> ''একটুখানি আঙিনা আর একটুখানি আকাশ, দিনে এটুকু দেখতে পারলেই মনে হত– আমি আছি পৃথিবী এখনো রয়েছে। অথচ এতটুকু আঙিনা আর এতটুকু আকাশ–আমার মনের সামনে তো ছিল সমস্ত কলকাতা আর সমস্ত পৃথিবী, অতীত ও ভবিষ্যৎও।''[১১]

আশাবাদী গোপাল হালদারের চিন্তাধারা তাঁর সমস্ত রচনাসম্ভারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তিনি কৃষকসভা ও কর্মচারী আন্দোলনে নেতৃত্বদানও করেছিলেন। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক হিসেবে নিজের দায়িত্ব, কর্তব্যকে নিপুণভাবে সামলেছেন। শিল্পী সংঘ এবং সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিতে বুদ্ধিজীবী হিসেবে

দায়িত্ব পালন করেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে ছিল সত্তার মিলন। এই পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত। তারপরে কিছুদিন বিরতির পর আবার 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনা করেন ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত।

গোপাল হালদারের বহুমুখী সংগ্রামী, কর্মনিষ্ঠ জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী বলে অভিহিত গোপাল হালদার মানবতাবাদী, মুক্তবুদ্ধি বিচিত্রকর্মা পুরুষ। তিনি আজীবনব্রতী থেকেছেন দেশ সেবায়। চিত্ত দিয়ে পালন করেছেন 'তুমি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত' বাণীকে, এই মা দেশ মা, সকলের মা। শৈশব থেকে যার পদযাত্রা বিপ্লবের পথ পরিক্রমায়। তিনি কর্মে, সৃজনে-ভাষণে, বক্তৃতায় অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গ দিয়ে দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। মানবতাবাদী গোপাল হালদার মানুষের সামগ্রিক আত্মবিকাশের স্বার্থেই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শৈশব থেকে আজীবন সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে, সাহিত্য সাধনাকে আত্মপ্রকাশের অন্যতম পথ রূপে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করেছেন স্বদেশ সাধনা ও সাহিত্য সাধনার মধ্যেই। গোপাল হালদার বাঙালি বুদ্ধিজীবী হিসেবে বহুবার দেশ-বিদেশের অনেক অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, হাঙ্গেরি, পূর্ব জার্মানি, চেকোশ্লোভিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। গোপাল হালদারের কর্মজীবন এবং সৃজন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলা যায়। একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করলে যেন ভাবের ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা রয়ে যায়। ১৯৯৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর এই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব পরলোক গমন করেন।

কর্ম এবং কৃতিত্ব

১। ১৯২৫-২৬ সাল, নোয়াখালি শহরে ওকালতি শুরু।

২। ১৯২৬ সালে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ম পরিষদের সদস্যরূপে যোগ।

৩। ১৯২৬-২৮ সাল, প্রবাসী সাপ্তাহিক 'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের তত্ত্বাবধানে ভাষাতত্ত্বে গবেষণাকর্মে নিযুক্ত।

৪। ১৯২৯-৩০ সালে ফেনী কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগদান।

৫। ১৯৩০-৩২ সাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরু সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট

রূপে অংশগ্রহণ।

৬। ১৯৩২-৩৮ সালে, প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দি। কিছুদিন বক্সায় তারপর তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়।

৭। ১৯৩৮-৪৯ সাল, কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওয়ার্ড ব্লকের' সহকারী সম্পাদক রূপে যোগ।

৮। ১৯৪১ সালে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান।

৯। ১৯৪২ সালে, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড দৈনিক পত্রিকার সহ সম্পাদক।

১০। ১৯৪১-৪২ সাল, কলিকাতা ওয়ার্কস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক।

১১। ১৯৪৪-৪৮ সাল, 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক।

১২। ১৯৪৫ সাল, প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দী।

১৩। ১৯৫২-৫৮ সাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য।

১৪। ১৯৫২-৫৮ সাল, স্টকহলম্ শান্তি সম্মেলনে যোগদান, সুনীতি কুমারের সঙ্গে চীন জনগণতন্ত্রের আমন্ত্রণে চীনদেশে ভ্রমণ।

১৫। ১৯৫২-৬৭, আবার পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক।

১৬। ১৯৫২-৬৮, বিধান পরিষদের সদস্য।

১৭। ১৯৬২ সালে মস্কো শান্তি সম্মেলনে যোগদান।

১৮। ১৯৬৩ সালে, মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সম্মেলনে যোগদান।

১৯। ১৯৬৭-৭০ সাল, পশ্চিমবঙ্গের কো-অপারেটিভ বোর্ডের ডিরেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণ।

২০। ১৯৫৮ সাল, সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার পেয়েছিলেন। রুশ বিপ্লবের রূপরেখা গ্রন্থের জন্য। ১৯৬৮ তেই শ্রেষ্ঠ গবেষকরূপে তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'সরোজিনী স্মৃতি' স্বর্ণপদক প্রদান করে।

২১। ১৯৬৯ সালে, প্রফুল্ল ঘোষের সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন।

২২। ১৯৭৬-৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতরের অন্তর্গত, সাহিত্য ও কলা শাখায় ফেলোশিপ গ্রহণ করেন।

২৩। ১৯৭৭ সালে, শরৎ স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

২৪। ১৯৮০ সালে, রূপনারায়ণের কূলে (আত্মজীবনী) ২য় খণ্ডের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে পুরস্কৃত হন।

২৫। ১৯৮৫ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি প্রদান করা হয়।

২৬। ১৯৮৬ সালে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানিত হন ডি. লিট উপাধিতে।

২৭। ১৯৮৮ সালে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গোপাল হালদারকে ডি. লিট সম্মানে ভূষিত করেন।

২৮। ১৯৯০ সালেও সম্মান লাভ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট।

২৯। ১৯৯৩, সম্মানিত ডি. লিট উপাধি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

সৃজন

সৃষ্টিমূলক বিভিন্ন উপন্যাস এবং সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থ রচনাসমূহ —

১। ১৯৩৯ – একদা।

২। ১৯৪১ – সংস্কৃতির রূপান্তর।

৩। ১৯৪২ – ধূলাকণা (গল্পগ্রন্থ), বাজে লেখা।

৪। ১৯৪৪ – পঞ্চাশের পথ।

৫। ১৯৪৫ – তেরশ পঞ্চাশ।

৬। ১৯৪৮ – ভাঙন, এ যুগের যুদ্ধ, বাঙালি সংস্কৃতির রূপ।

৭। ১৯৫০ – উজান গঙ্গা, অন্যদিন, স্রোতের দ্বীপ।

৮। ১৯৫১ – আর কতদিন, স্বপ্ন ও সত্য (বাজে লেখার পরিবর্তিত নাম)।

৯। ১৯৫২ – ভূমিকা।

১০। ১৯৫৩ – নবগঙ্গা।

১১। ১৯৫৪ – জোয়ারের বেলা, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ১ম খণ্ড।

১২। ১৯৫৬ – ভাঙণীকূল, বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি, আড্ডা।

১৩। ১৯৫৮ – বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ২য় খণ্ড।

১৪। ১৯৬০ – বনচাঁড়ালের কড়চা।

১৫। ১৯৫১ – ইংরাজি সাহিত্যের রূপরেখা।

১৬। ১৯৬৬ – রুশ সাহিত্যের রূপরেখা।

১৭। ১৯৬৭ – ভারতের ভাষা।

১৮। ১৯৬৯ – রূপনারাণের কূলে (আত্মজীবনী ১ম খণ্ড)।

১৯। ১৯৭২ – বাঙালির আশা বাঙালির ভাষা।

২০। ১৯৭৮ – 'ত্রিদিবা' (একদা, অন্যদিন, আর একদিন) ত্রয়ীরূপে প্রকাশ, রূপনারাণের কূলে আত্মজীবনীর ২য় খণ্ড, আলোচনাগ্রন্থ সতীনাথ ভাদুরী : সাহিত্য ও সাধনা।

২১। ১৯৮৫ – শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ।

২২। ১৯৮৬ – সংস্কৃতির বিশ্বরূপ। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ।

২৩। ১৯৯১ – প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর।

বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় গোপাল হালদারের নামে, ছদ্মনামে প্রকাশিত কিছু রচনার আংশিক তালিকা—

	সাল	রচনা	পত্রিকা
১।	১৩২৭, মাঘ	বাঙালি যুবক ও নন কর্পোরেশন (অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে)	সবুজপত্র
২।	১৩৩৩, কার্তিক-অগ্রহায়ণ	নটরাজের নৈবেদ্য	সবুজপত্র
৩।	১৩২৮, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ	শেষ চিঠি (প্রফুল্ল হালদার ছদ্মনামে)	ভারতবর্ষ
৪।	১৩২৮, পৌষ	দু'দিনের সহযাত্রী	ভারতবর্ষ
৫।	১৩২৮, বৈশাখ	শিল্পী (টলস্টয় বিষয়ক)	ভারতবর্ষ
৬।	১৩২৯, শ্রাবণ	পয়লা আষাঢ়	ভারতবর্ষ
৭।	১৩৩০, পৌষ	বিপথে	ভারতবর্ষ
৮।	১৩৩১, আষাঢ়	সৌন্দর্য সৃষ্টি ও মরমী কবিতা	ভারতবর্ষ
৯।	১৩৩২, বৈশাখ	চিত্রশালায়	ভারতবর্ষ

১০।	১৩৩৮, ভাদ্র	সমসাময়িক সাহিত্য	ভারতবর্ষ
১১।	১৩৩৪, ফাধন	শেষ মহাসঙ্গীত (শ্রী মহাকল্যাণ ছদ্মনামে)	শনিবারের চিঠি
১২।	১৩৩৯, ফাধন	রবি মৈত্রের মৃত্যুতে লেখা চিঠি	ভারতবর্ষ
১৩।	১৩৪৭, আশ্বিন	বর্তমান পলিটিক্স-এর পথ	সমসাময়িক
১৪।	১৩৪৭, আশ্বিন	রবীন্দ্রনাথের সানাই কাব্যের পর্যালোচনা	সমসাময়িক
১৫।	১৩৪৮, শ্রাবণ	রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা	দেশ
১৬।	১৩৫০,	সোমেন স্মৃতি সংখ্যা— রমা র‍্যোঁলা	প্রতিরোধ
১৭।	১৩৫৪, বৈশাখ	সংস্কৃতি না বিকৃতি	মেঘনা
১৮।	১৩৫৭, কার্তিক	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	নতুন সাহিত্য
১৯।	১৩৫৭, অগ্রহায়ণ	পথের পাঁচালী	শনিবারের চিঠি
২০।	১৩৬০, আষাঢ়	সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ	নতুন সাহিত্য
২১।	১৩৬০, আশ্বিন	আড্ডা থেকে আসর	নতুন সাহিত্য
২২।	১৩৬২, আশ্বিন	রাজভোগ	নতুন সাহিত্য
২৩।	১৩৬৩, আশ্বিন	ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্য	নতুন সাহিত্য
২৪।	১৩৬৩, অগ্রহায়ণ	আড্ডা	নতুন সাহিত্য
২৫।	১৩৬৮, শ্রাবণ	নাটক — রক্তকরবীর রূপান্তর	নতুন সাহিত্য
২৬।	১৯৪০,	ডে অফ রেকর্ডিং (এই লেখার জন্য সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসুকে সিডিশন চার্জে গ্রেফতার করা হয়)	ফরোয়ার্ড ব্লক
২৭।	১৯৪১, জানুয়ারি	আর. ই. বের্গাস	আনন্দবাজার পত্রিকা
২৮।	১৯৪২, ফেব্রুয়ারি-মে	কানপুর ও নাগপুর	অরণি
২৯।	১৯৪৬, ফেব্রুয়ারি	ডাক আসিয়াছে	স্বাধীনতা
৩০।	১৯৫৯, ফেব্রুয়ারি	সভাপতির ভাষণ	এ.বি.টি.-এর বার্ষিক সম্মেলনে

৩১।	১৯৬৬, অক্টোবর	মহাজাতির রূপায়ণ	কালান্তর
৩২।	১৯৬৬, অক্টোবর	ভাষার অরণ্য	কালান্তর
৩৩।	১৯৮১, ফেব্রুয়ারি	প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা ও ইংরেজি ভাষার বিতর্কে দু-এক কথা	কালান্তর
৩৪।	১৯৬৬, অক্টোবর	সাংস্কৃতিক বিপ্লব না বিপ্লবী সংস্কৃতি	কালান্তর
৩৫।	১৯৭৪	সুনীতিকুমার স্মরণে লেখা শারদীয়া	অমৃত
৩৬।	১৯৮০, মে	রবীন্দ্রনাথের মানবতা	সত্যযুগ
৩৭।	১৯৮১, এপ্রিল	বাংলা সংস্কৃতির রূপরেখা	যুগান্তর
৩৭।	১৯৮৫, মার্চ	সোমনাথ লাহিড়ী প্রসঙ্গে	কালান্তর
৩৯।	১৯৮৬	শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দায়িত্ব	রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সুভিনিয়র
৪০।	১৯৮৯, ফেব্রুয়ারি	কমিউনিস্ট পার্টি আমার কাছে সার্বিক মুক্তির বহমান ঝর্ণা	কালান্তর
৪১।	১৯৯০, এপ্রিল	রবীন্দ্রনাথ কি আজও প্রাসঙ্গিক	সংবাদ পর্যালোচনা
৪২।	১৯৯০, মে	আধুনিক বাংলার সংস্কৃতির সংকট	অ্যাকাদেমি পত্রিকা
৪৩।	১৯৯০, সেপ্টেম্বর	খোলাদুয়ারি গণতন্ত্র	কালান্তর
৪৪।	১৯৯০, সেপ্টেম্বর	(নীরেন্দ্রনাথ রায় সংখ্যা) রাজনৈতিক পর্যালোচনা	পরিচয়
৪৫।	১৯৯২, মে	সত্যজিৎ স্মৃতি সৌরভ	কালান্তর
৪৬।	১৯৯২, ফেব্রুয়ারি	আমার জীবন ও সাহিত্য	কালান্তর
৪৭।	১৩৩২, ফাধন	কালের কোপ (গল্প)	প্রবাসী
৪৮।	১৩৩৩, বৈশাখ	করিম (গল্প)	প্রবাসী
৪৯।	১৩৩৩, কার্তিক	তারকার জন্ম (গল্প)	প্রবাসী
৫০।	১৩৩৬, বৈশাখ	তারকার জন্ম (গল্প)	প্রবাসী

৫১।	১৩৩৬, চৈত্র	বর্তমান জার্মানির চিন্তাধারা	প্রবাসী
৫২।	১৩৩৮, বৈশাখ	নওজোয়ানের রাষ্ট্রচিন্তা (প্রবন্ধ)	প্রবাসী
৫৩।	১৩৪৬, বৈশাখ	ত্রিপুরার মন্ত্রী (প্রবন্ধ)	প্রবাসী
৫৪।	১৩৪৬, শ্রাবণ	সার্লোর প্রদর্শনী	প্রবাসী
৫৫।	১৩৪৬, আশ্বিন	সাহিত্য কথা মোহিতলাল মজুমদার (পুস্তক পরিচয়)	প্রবাসী
৫৬।	১৩৪৭, বৈশাখ	রাজনীতি মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স' পুস্তকের অনুবাদ মনোরঞ্জন গুপ্ত	প্রবাসী
৫৭।	১৩৪৭, অগ্রহায়ণ	ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্য পরিচয়	প্রবাসী
৫৮।	১৩৪৭, পৌষ	ভারতীয় কারু শ্রমিকের শিক্ষা (প্রবন্ধ)	প্রবাসী
৫৯।	১৩৪৭, পৌষ	জাগৃহি, রেজাউল করিম (পুস্তক সমালোচনা)	প্রবাসী

গোপাল হালদার সম্পর্কিত গ্রন্থের তালিকা (অসম্পূর্ণ) — পর্যালোচনা

বুদ্ধিজীবীদের মননে ও কলমে — একটি আংশিক সূচি

	প্রকাশকাল	লেখকের নাম	রচনা	পত্রিকা
১।	১৯৩৯, নভেম্বর	সুবোধ চৌধুরী	একদা (পুস্তক পর্যালোচনা)	অগ্রণী
২।	১৯৪০, সেপ্টেম্বর	করালীকান্ত বিশ্বাস	একদা (পুস্তক পর্যালোচনা)	সমসাময়িক
৩।	১৯৪০, মে	মনীন্দ্র রায়	একদা (পুস্তক পর্যালোচনা)	পরিচয়
৪।	১৯৮২, অক্টোবর	বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	গোপাল হালদারের রাজনীতি : রাজনীতির উপন্যাস	কালান্তর
৫।	১৩৫৭, বৈশাখ	নারায়ণ ভট্টাচার্য	অন্যদিন	নতুন সাহিত্য
৬।	১৯৫৯, শ্রাবণ	সরোজ বন্দোপাধ্যায়	আর একদিন	নতুন সাহিত্য
৭।	১৩৫৯	অচ্যুত গোস্বামী	অনাগতের প্রতীক্ষায় (ভূমিকা উপন্যাসের আলোচনা)	নতুন সাহিত্য

৮।	১৩৬২, জ্যৈষ্ঠ	কার্তিক লাহিড়ী	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (পুস্তক পর্যালোচনা)	নতুন সাহিত্য
৯।	১৩৬৩, অগ্রহায়ণ	অচ্যুত গোস্বামী	বাংলা সাহিত্যে মানবস্বীকৃতি (পুস্তক পর্যালোচনা)	নতুন সাহিত্য
১০।	১৯৬৮, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	চিত্ত ঘোষ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর রায়চৌধুরী	সাক্ষাৎকার	পরিচয়
১১।	১৯৭৪, অক্টোবর	কার্তিক লাহিড়ী	চেতনা প্রবাহ : অন্তঃশীলা ও একদা	এক্ষণ
১২।	১৯৭৭, অক্টোবর	অপূর্ব কর	প্রসঙ্গ গোপাল হালদার	কালমৃগয়া
১৩।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	অনিল কুমার কাঞ্জিলাল	গোপাল হালদার স্বনাম পুরুষো ধন্য	পরিচয়
১৪।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	বাহাত্তর উত্তরীতে	পরিচয়
১৫।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	সিদ্ধেশ্বর সেন	সমগ্রের সত্য	পরিচয়
১৬।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	কার্তিক লাহিড়ী	ত্রিদিবার আধুনিকতা	পরিচয়
১৭।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যায়	স্বগত নিবন্ধ : গোপাল হালদার	পরিচয়
১৮।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	অনিমেষ কান্ত পাল	বাংলা উপভাষা চর্চার ত্রিধারা	পরিচয়
১৯।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	প্রশান্ত কুমার দাসগুপ্ত	ভাষাতত্ত্ব চর্চায় গোপাল হালদার	পরিচয়

২০।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	অভ্র ঘোষ	জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও প্রবাসী-র হাওয়া : গোপাল হালদারের চোখে	পরিচয়
২১।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	রমেন্দ্র বর্মণ	বাংলা সাহিত্যের চর্চা, যুগ বিভাগ, গোপাল হালদারের চোখে	পরিচয়
২২।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	আশীষ মজুমদার	আত্মকথা : দেশকথা	পরিচয়
২৩।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	দেবেশ রায়	উপন্যাস ও আত্মজিজ্ঞাসা	পরিচয়
২৪।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	অরুণ সেন	নতুন সংস্কৃতি, নতুন নিরিখ	পরিচয়
২৫।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	রণেশ দাশগুপ্ত	অনন্য ত্রিদিবা	পরিচয়
২৬।	১৯৮০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	অশোক ভট্টাচার্য	রূপকথা প্রসঙ্গে গোপাল হালদার	পরিচয়
২৭।	১৯৮০	সোমনাথ লাহিড়ী	তিনি একজন যথার্থ শিক্ষিত লোক (ভাষণ)	সীমান্ত
২৮।	১৯৮০	মনীন্দ্র রায়	গোপালদা	সীমান্ত
২৯।	১৯৮০, মে-জুন	বীতশোক ভট্টাচার্য	সাক্ষাৎকার	জলার্ক
৩০।	১৯৮১, মে	শঙ্খ ঘোষ	একদা অন্যদিন আর একদিন	বেতার জগৎ
৩১।	১৯৮২	বাসব দাশগুপ্ত	গোপাল হালদার রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত	কালমৃগয়া
৩২।	১৩৫৩, পৌষ	শ্রী গিরিজাপতি ভট্টাচার্য	পঞ্চাশের পথ– উপপঞ্চাশী	পরিচয়
৩৩।	১৯৮৩, সেপ্টেম্বর	চার্বাক সেন	ভূমিকা থেকে উজান গঙ্গা	সীমান্ত

৩৪।	১৯৮৯, মে	সুব্রত রায়চৌধুরী	রূপশিল্পী গোপাল হালদার ও ত্রিদিবা	অতএব ভাবনা
৩৫।	১৯৮৯, জুলাই (সংখ্যা)	অমূল্য বিশ্বাস	প্রসঙ্গ গোপাল হালদার : কলকাতা থেকে পাটনা, ঘটনা ও রটনা	কালান্তর
৩৬।	১৯৮৯, সেপ্টেম্বর	বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	সমকালীন ইতিহাসের কথাকার	চতুরঙ্গ
৩৭।	১৯৮৯, সেপ্টেম্বর	যাদব দত্ত	সাক্ষাৎকার	বৈরী
৩৮।	১৯৯০, মে	সুব্রত রায়চৌধুরী	ইতিহাসের পটে নারী প্রগতি : প্রসঙ্গত গোপাল হালদার	অতএব ভাবনা
৩৯।	১৯৯২, জানুয়ারি	অমিয় ধর	গোপাল হালদার জীবন ও সাহিত্য	অতএব ভাবনা
৪০।	১৯৯২, মে	শৈলেশ বিশ্বাস	কথাশিল্পী গোপাল হালদার	অতএব ভাবনা
৪১।	১৯৯২, মে	যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	স্বগত নিবন্ধে গোপাল হালদার	অতএব ভাবনা
৪২।	১৯৯২, মে	সুব্রত রায়চৌধুরী	ত্রিদিবা : রূপে ও স্বরূপে	অতএব ভাবনা
৪৩।	১৯৯২, মে	সুরেশ মিত্র	সংস্কৃতির রূপান্তর : রূপান্তরের কারিগর গোপাল হালদার	অতএব ভাবনা
৪৪।	১৯৯২, ডিসেম্বর	শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়	স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে অনন্য গোপাল হালদার	কালান্তর
৪৫।	১৪০০	অমিয় ধর	গোপাল হালদার : কমিউনিস্ট আন্দোলনের সব্যসাচী	কালান্তর শারদীয়া
৪৬।	১৯৯৩-৯৪, ডিসেম্বর-জানুয়ারি	অমিয় ধর	প্রসঙ্গ গোপাল হালদার	কলেজ স্ট্রিট
৪৭।	১৯৯৬, ডিসেম্বর	অমিয় ধর	গোপাল হালদারের ‘মন্বন্তরে’	তথ্যসূত্র
৪৮।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	অরুণা হালদার (স্ত্রী)	প্রসঙ্গ গোপাল হালদার	পরিচয়
৪৯।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	সোমনাথ লাহিড়ী	তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত লোক	পরিচয়
৫০।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	গোপাল হালদার : ৫৬ বছরের স্মৃতি	পরিচয়

৫১।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	কবীর চৌধুরী	গোপাল হালদার স্মরণে	পরিচয়
৫২।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	শঙ্খ ঘোষ	কয়েদির আকাশ	পরিচয়
৫৩।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	ক্ষেত্র গুপ্ত	সাহিত্যের ইতিহাস, ইতিহাসের তত্ত্ব	পরিচয়
৫৪।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	সুধীরকুমার করন	লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে গোপাল হালদার	পরিচয়
৫৫।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	বিশ্বহিন্দু ভট্টাচার্য	সাহিত্য সমালোচনা গোপাল হালদার	পরিচয়
৫৬।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	গৌতম চট্টোপাধ্যায়	দেশপ্রেমিক, বিপ্লববাদী, কমিউনিস্ট গোপাল হালদার, ১৯২০-৪৫	পরিচয়
৫৭।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	রবীন্দ্র গুপ্ত	'ত্রিদিবা'-র গোপাল হালদার	পরিচয়
৫৮।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	সুরেশ মৈত্র	গোপাল হালদার : সমাজবিজ্ঞানী ও সংস্কৃতি চেতনার ভাষ্যকার	পরিচয়
৫৯।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	প্রশান্তকুমার দাসগুপ্ত	পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাচর্চায় গোপাল হালদার	পরিচয়
৬০।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	সুব্রত রায়চৌধুরী	গোপাল হালদারের 'মন্বন্তরে' : তেরশ পঞ্চাশ	পরিচয়
৬১।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	জ্যোতির্ময় ঘোষ	বাংলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার	পরিচয়
৬২।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	ধনঞ্জয় দাশ	প্রগতি সংস্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার	পরিচয়
৬৩।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	বাসব সরকার	গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত	পরিচয়
৬৪।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	বিনয় চৌধুরী	স্মৃতিচারণ	পরিচয়
৬৫।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	সুধী প্রধান	স্মৃতিচারণ	পরিচয়
৬৬।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	মনসুর হবিবুল্লা	স্মৃতিচারণ	পরিচয়
৬৭।	১৯৯৪, মার্চ-জুন	অমিয় ধর	বিশ শতকের ঘটনাক্রম ও গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী	পরিচয়
৬৮।	১৯৯৪, এপ্রিল	অমিয় ধর	ঔপন্যাসিক গোপাল হালদার	বারো মাস
৬৯।	১৯৯৪, মে	অমিয় ধর	প্রয়াণ লেখা	আকাডেমি পত্রিকা

৭০।	১৯৯৪, জুলাই	অমিয় ধর	বিশ শতকের নবচেতনার পথিকৃৎ	যুগান্তর
৭১।	১৯৯৬, ডিসেম্বর	অমিয় ধর	গোপাল হালদার 'মন্বন্তর' : তেরশ পঞ্চাশ	তথ্যসূত্র

(তালিকাটি গৃহীত, সুব্রত রায়চৌধুরী, গোপাল হালদার : প্রসঙ্গ ত্রিদিবা, ওয়ানটাচ পাবলিশার্স, কলকাতা-১৪, ১৯৯৭)

তথ্যসূত্র :

১। ড. অজিতকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ, ২০০৭, পৃঃ ১২ (টমসনের অনুবাদ করা 'শ্রীকান্ত' এর ইংরেজি গ্রন্থের ভূমিকা অংশ)

২। দেবলীনা ব্যানার্জী কেজরিওয়াল, ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা-৭২, ২০১১, অনুবাদিকার কথা অংশ

৩। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ, ২০০১-২০০২, পৃঃ ৫৫২

৪। স্বপন দাসাধিকারি, প্রসঙ্গ ধূর্জটিপ্রসাদ, জলার্ক প্রকাশন, কলকাতা-৪০, ১৩৯২, পৃঃ ২০৫

৫। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী - ৩য় খণ্ড, (মনে এলো), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃঃ ৫২

৬। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী - ২য় খণ্ড, (নূতন ও পুরাতন/বক্তব্য), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃঃ ১৭৮-১৭৯

৭। স্বপন দাসাধিকারি, প্রসঙ্গ ধূর্জটিপ্রসাদ, জলার্ক প্রকাশন, কলকাতা-৪০, ১৩৯২, পৃঃ ১৯৬

৮। গোপাল হালদার, রূপনারানের কূলে - ১ম খণ্ড, পুথিপত্র, কলকাতা-৯, ২০০৮, পৃঃ ৮১

৯। দেবেশ রায় (সম্পাদক), গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, পরিচয়, কলকাতা-৭, ১৯৮০, পৃঃ ৩৩

১০। সুব্রত রায়চৌধুরী, গোপাল হালদার : প্রসঙ্গ ত্রিদিবা, ওয়ানটাচ পাবলিশার্স, কলকাতা-১৪, ১৯৯৭, পৃঃ ৫

১১। দেবেশ রায় (সম্পাদক), গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, পরিচয়, কলকাতা-৭, ১৯৮০, পৃঃ ৭